The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 1 - 12)
Published in December, 2023

চট্টগ্রামে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ: ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

ড. নূরুল ইসলাম*

প্রতিপাদ্যসার

চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ। আধুনিককালের মত অতীতেও চট্টগ্রাম সমগ্র প্রাচ্যে গৌরবোজ্জ্বল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। এখানকার ভূমিব্যবস্থাও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রামের ভূমিব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এখানে অনেক ছোট ছোট জমিদারির উদ্ভব। এর কারণ, এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য সর্বদা দুর্গ-রক্ষী যে সৈন্যদল রাখা হতো বেতনের পরিবর্তে তাদেরকে কিছু কিছু জমি দিয়ে দেয়া হতো। সামরিক জায়গির প্রথা উঠে গেলে সরকার ঐ সকল জমির উপর রাজস্ব ধার্য করে। এগুলো উক্ত সময়ের মধ্যে জমিদারিতে পরিণত হয়। এছাড়াও ভাগ্যান্বেষীরা নিরাপত্তার খাতিরে দলবদ্ধভাবে চট্টগ্রামে আসত। প্রত্যেক দলের নেতাকে তাঁর যতগুলো অনুচর থাকত ততটুকরা বা তার কিছু বেশি জমি দিয়ে দেয়া হতো। পরে এক নেতার অনুচররা যত টুকরা জমি চাষ করত ঐগুলোকে একত্রে ধরে ঐ নেতার নামে তরফ সৃষ্টি করা হয়। এটিই চট্টগ্রামের জমিদারি প্রথা এবং বাংলার অবশিষ্টাংশের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রথম ভূমি জরিপ হয়। এ জরিপের আওতাভুক্ত তরফগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আসে। পরবর্তী সময়ে এখানে আরো অনেক জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। ভূমি বন্দোবস্ত ভিত্তিক চট্টগ্রামে সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী এ সব জরিপের মাধ্যমে বন্দোবস্তকৃত ভূমি নোয়াবাদ ভূমি নামে পরিচিত। এছাড়াও আলোচ্য সময়ের মধ্যে আরাকান থেকে অনেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে জমিদারি লাভ করে। এভাবে চট্টগ্রামে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে জমিদারদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

চট্টগ্রাম তথা বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিলেন জমিদার শ্রেণি। রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝখানে খাজনা-আদায়ের মাধ্যম হিসেবে এ শ্রেণি কাজ করত। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে এদেশে যে মধ্য, উপ ও নিম্ন ভূস্বত্বাধিকারী শ্রেণি ছিল তাদের সংখ্যা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিল

*অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

'পিরামিড' সদৃশ। W W Hunter এদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ২০টি মত (Hunter 1875, 107)। B. H. Baden Powel -এর মতে, ক্ষেত্র বিশেষে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০টির মত (Powel 1875, 538)। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালুর পর বাংলায় অঞ্চল ভিত্তিক যে বৃহৎ জমিদারি গড়ে উঠেছিল, সে রকম কোন বড় জমিদারি চট্টগ্রামে ছিল না। এখানকার জমিদারিগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার হাতে নেয় তখন চট্টগ্রামে জমিদারের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন (*Fifth Report* 1917, 426)। ১৭৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভূমি জরিপের মাধ্যমে এ সমস্ত জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় আসে।

চট্টগ্রামে জমিদারদের উদ্ভব ও বিকাশ

আলোচ্য সময়ে চট্টগ্রামের জমিদারদের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করে এদেরকে প্রধানত চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক. সামরিক জমিদার;
খ. প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত জমিদার;
গ. ইউরোপীয় জমিদার;
ঘ. আরাকানি জমিদার।

ক. সামরিক জমিদার

সামরিক জমিদারেরা বিশেষত মোগল আমলে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এরা মূলত শাসকশ্রেণীর সাথে সামরিক ব্যক্তি হিসেবে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম বিজয়ের পর তারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। কালক্রমে এরা জমিদারে পরিণত হয়।[১] সামরিক জমিদারদের মধ্যে নিয়ামত খান, জবরদস্ত খান, তাজ সিং ও মনগট রাম হাজারী উল্লেখযোগ্য।

নিয়ামত খানের পূর্বপুরুষ বুজর্গ উমেদ খান কর্তৃক ১৬৬৫-৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় মোগল সৈন্যবাহিনীতে অংশ নিয়েছিলেন। বুজুর্গ উমেদ খাঁ চট্টগ্রাম বিজয়ের পর সীমান্ত রক্ষা এবং উপদ্রব দমনের জন্য ১২ জন হাজারীকে নিযুক্ত করেছিলেন। এদের মধ্যে দু'জনকে আরাকানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সঙ্খ নদীর তীরে নিযুক্ত করে জায়গীর প্রদান করেন। তাদের প্রত্যেকের অধীনে এক হাজার সৈন্য ছিল। তখন থেকে এ স্থান 'দোহাজারী' নামে পরিচিতি লাভ করে (মাহবুব উল আলম ১৯৬৭, ১৭)। এদের একজন আধু খাঁ এবং অপরজন হলেন জোরওয়ার সিংহ হাজারী।

আধু খাঁর পিতা নবাব বাহাদুর খাঁ বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বকালে রোহিলাখণ্ডের আমীর ছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন পাঠান। আধু খাঁ এ অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়ে তা দক্ষতার সাথে পালন করেন এবং পাশাপাশি তাঁর পুত্র শের জামাল খাঁকে সাথে নিয়ে নিজ জমিদারি দক্ষিণে লোহাগাড়া থেকে উত্তরে রাঙ্গুনিয়া পর্যন্ত বিস্তার ঘটান। আধু খাঁয়ের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র শের জামাল খাঁ ও রহমত খাঁ চট্টগ্রাম শহরের যথাক্রমে জামাল খাঁ ও রহমতগঞ্জ এলাকায় বসবাস করেন। এদের নামানুসারে আধুনিক জামাল খাঁ ও রহমতগঞ্জের উৎপত্তি হয়। শের জামাল খাঁ নিজামপুর পরগণার জমিদার চৌধুরী কাদের এয়ার খাঁর কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর জমিদারির

আরো বিস্তৃতি ঘটান। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে শের জামাল খাঁর পুত্র নিয়ামত খাঁয়ের নামে তাদের জমিদারি বন্দোবস্ত হয়। সাঙ্গু নদীর উভয় তীরে পটিয়া ও সাতকানিয়াসহ চট্টগ্রামের ৩৯টি গ্রামে এ জমিদারি বিস্তৃত ছিল (*Revenue Consultations* 6 September 1774)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ১২,৬৮৭ টাকায় এটি নূরচম্পা পুশা বিবির নামে বন্দোবস্ত হয়। তিনি নিয়ামত খাঁ ও নূর চেমনা পাঠানী দম্পতির মেয়ে ছিলেন। পুশা বিবির মৃত্যুর পর তাঁর পালকপুত্র ফজর আলী খাঁ দোহাজারী এস্টেটের মালিক হন (চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি ২০০৪, ৬৯)।

জোরওয়ার সিংহ হাজারী সেনাপতি লক্ষ্মণ সিংহ হাজারীর পুত্র। লক্ষ্মণ সিংহ দুই হাজার সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। শঙ্খ নদীর তীরে আধু খাঁ'র মত তিনি দুর্গ স্থাপন করে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনিও বিস্তীর্ণ ভূমির জায়গির লাভ করে জমিদারে পরিণত হন। তাঁর পুত্র জোরওয়ার সিংহ হাজারীর সময় চট্টগ্রামের হাজারীরা (১২ জন হাজারী) বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে, যা মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। ফলে এ সময় চট্টগ্রামের মোগল শাসক 'দেওয়ান মহাসিংহ' (১৭৫৩-১৭৫৮) ১২ জন হাজারীর মধ্যে ১০ জনকে কৌশলে সীতাকুণ্ডস্থ তাঁর কার্যালয়ে নিয়ে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তাদেরকে পিঞ্জিরাবন্দী করে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে মারেন (Cotton 1880, 6)। যে দু'জন হাজারী এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না তাঁরা হলেন আধু খাঁর পুত শের জামাল খাঁ এবং জোরওয়ার সিংহ হাজারী। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জোরওয়ার সিংহ হাজারী পুত্র মনগট রাম সিংহ হাজারীর নামে জমিদারি বন্দোবস্ত হয় (Alamgir Muhammad Serajuddin 1971, Appendix G)।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার শোলকাটা গ্রামের বিখ্যাত জমিদার শেরমস্ত খানের পুত্র ছিলেন জবরদস্ত খান। কোন কোন গবেষক তাঁর অপর নাম মনু মিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জমিদারির আয়তন ছিল ৩,১৯৪ একর এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তি 'তরফ জবরদস্ত খাঁ' নামে বন্দোবস্তকৃত ছিল (মমতাজ ও নাসরিন ২০১৩ : ২০৭)। এ জমিদারি জেলার ছয়টি থানার ৭১টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ইতিহাসের কিংবদন্তী বাঁশখালির সরলা গ্রামের অপরূপ সুন্দরী মলকা বানুকে বিয়ে করেন। তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। জবরদস্ত খানের মৃত্যুর পর বিশাল জমিদারির অর্ধেক বড় বোন কালাবিবি এবং অপর অংশ স্ত্রী খোরশা বানু ও মলকা বানু ভাগাভাগি করে নেয়। বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকার জমিদারি মলকা বানুর ভাগে পড়ে (জহিরুল ইসলাম ২০০১, ৬৩) ।

রামু সিং ১৬৬৫-৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বুজুর্গ উমেদ খাঁয়ের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রামু সিং এর পৌত্র ছিলেন তাজ সিং। তাজ সিং ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের বন্দোবস্তে একজন জমিদার হিসেবে তালিকাবদ্ধ হন। তাঁর জমিদারির মোট পরিমাণ ছিল ৪,৯২৮ একর, যা ৬১টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল (Alamgir Muhammad Serajuddin 1971, 185)।

সামরিক জমিদারদের মধ্যে অন্যতম পরিবার ছিল মনোহর রায় জমিদারি। ১৭৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দের হিসেব মতে এ জমিদারি ছিল চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহত্তম জমিদারি। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজারাম রায়। চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁর জমিদারি বিদ্যমান ছিল। তাঁর চার পুত্র শ্রীযুক্ত রায়, দুর্গাপ্রসাদ রায়, শ্যাম রায় ও চাঁদ রায়। এদের মধ্যে শ্যাম রায় পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আনোয়ারার বিখ্যাত বড়উঠানের মিয়া বাড়ী জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত রায়ের তীর্থ-লব্ধ পত্নীর গর্ভে মনোহর রায়ের জন্ম হয়। মনোহর রায়ের জন্মের পর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জগদীশ রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত রায়ের মৃত্যুর

পর তাঁর জমিদারি দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয় (শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৩৬৬, ৩-৪)। মনোহর রায়ের বংশ ধরেরা পুরুষানুক্রমে চট্টগ্রামে তাদের জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন। জমিদারি পরিচালনা ছাড়াও এ বংশের অনেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ পদে চাকরিরত অবস্থায় ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরী ছাড়াও তিনি কবি সাহিত্যিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "আমার জীবন" সুধি সমাজে আজও সমাদৃত।

বড়উঠানের জমিদার আছদ আলী খান

চট্টগ্রামের দেয়াঙ পরগণার প্রসিদ্ধ বড়উঠানের মিয়া বাড়ী জমিদারী ছিলেন আঞ্চলিকভাবে খুবই পরিচিত। এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামরায় চৌধুরী। শ্যামরায় ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়কালে বুজুর্গ উমেদ খান'র সহযোগী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন এবং রাউজানে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেয়াঙ পরগণায় এসে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। এক পর্যায়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত জমিদারি মনোহর আলী খান জমিদারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইংরেজ আমলে এ বংশের অন্যতম জমিদার ছিলেন আছদ আলী খান। এছাড়াও জিন্নাত আলী খান, আকরম আলী খান, আনোয়ার আলী খান, ছালামত আলী খান, শের আলী খান এ বংশের জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

চৌধুরী কাদির ইয়ার খান পরিবার

চৌধুরী কাদির ইয়ার খান পরিবার ছিল মীরসরাই পরগণার বিখ্যাত জমিদার পরিবার। এ পরিবারে প্রতিষ্ঠাতা মীর গফুর খান। মীর নামানুসারে মীরসরাই নামকরণ করা হয়েছে বলে গবেষক, ঐতিহাসিক সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন (আহমদ মমতাজ ২০০৪, ৫১)। তিনি ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মীরসরাই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। বাংলার বার ভূঁইয়ার প্রধান ঈসা খাঁ তাঁর আত্মীয় ছিলেন। মীর গফুর খান এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তৎকালীন সরকার থেকে বিশাল জমিদারি লাভ করেন।

চৌধুরী কাদির ইয়ার খান ছিলেন মীর গফুর খানের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিশাল জমিদারির মালিক হন। তাঁর মৃত্যুর পর দুই পুত্র আমানত খান ও দেয়ানত খান জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। আমানত খান চিরকুমার ছিলেন। দেয়ানত খানের হুড়ি বিবি বা হাড়ি বিবি নামে এক কন্যা ছিল। এ হাড়ি বিবিও চিরকুমারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর চৌধুরী কাদের ইয়ার বংশ শেষ হয়ে যায় (আহমদ মমতাজ ২০০৪, ৬৬৮)।

সন্দ্বীপের জমিদার

মুসলমান আমলে সন্দ্বীপের ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন দিলাল খান। তিনি মোগল শাসকদের কাছ থেকে সন্দ্বীপ অধিকার করে প্রায় পঞ্চাশ বছর শাসন করেছিলেন (রাজকুমার চক্রবর্তী ১৯২৩, ১১২)। দিলাল খানের মৃত্যুর পর মোগল শাসকরা তাঁর জামাতা চাঁদ খানের সাথে সন্দ্বীপ অঞ্চলের ইজারার বন্দোবস্ত করেন। চাঁদ খান নিজে ও তাঁর দু'জন আত্মীয় এবং তৎকালীন কানুনগো দপ্তরের একজন কর্মচারীর মধ্যে সন্দ্বীপের এ সর্বময় ইজারা ভাগ করে নেন। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে এরাই সন্দ্বীপের জমিদার হন (সুপ্রকাশ রায় ২০০০, ৫২)।

চাঁদ খানের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের চতুর্থ পুরুষ আবু তোরাপ চৌধুরী জমিদারির একাংশ লাভ করেন। তিনি খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে তিনি অন্যান্য জমিদারদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি গোকুল ঘোষালের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। গোকুল বিতাড়িত জমিদারদের দিয়ে নবাব ও

ইংরেজদের কাছে অভিযোগ পেশ করেন। ইংরেজ গভর্নর আবু তোরাপকে দমনের জন্য ক্যাপ্টেন নলিকিনকে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে আবু তোরাপের মৃত্যু হলে তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পূর্বের জমিদারদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। গোকুল ঘোষাল সন্দ্বীপের আহাদদার হওয়ার সুযোগে আবু তোরাপের জমিদারি ভবানীচরণ দাসের নামে বন্দোবস্ত করেন। নোয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে, আবু তোরাপের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে গোকুল ঘোষাল কতিপয় চৌধুরীর জমিদারি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তা নিজে কুক্ষিগত করে নেন। পরে ভীতি প্রদর্শন ও উৎপীড়নের দ্বারা অন্য জমিদারদেরও তাদের জমিদারী তাঁর নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য করেন এবং এভাবে প্রায় সমস্ত দ্বীপটি তাঁর অধিকারভূক্ত হয় (Nurul Islam Khan 1977, 21-25)।

খোন্দকার পরিবার

কোম্পানির শাসনামলে কোয়েপাড়ায় খোন্দকারদের প্রাধান্য ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এ বংশ গৌড় থেকে আরাকান যাওয়ার পথে শেষ পর্যন্ত কোয়েপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ব্রিটিশ আমলে এ বংশের খ্যাতমান ব্যক্তি ছিলেন মুন্সী নূরুদ্দীন খোন্দকার। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে মে চট্টগ্রামের কালেক্টরি সনদ অনুসারে রাউজান থানার বাগোয়ান মৌজার ৩৩৭২৬ নং বাজেয়াপ্ত তালুক নূর মোহাম্মদের নামে সনদ প্রদান করা হয়।

পার্বত্য অঞ্চল

চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসে অনেক মগ জমিদার প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। এসব জমিদাররা প্রথমে আলীকদম ও পরে রাঙ্গুনিয়া হয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি পরিচালনা করেন। জমিদারের পাশাপাশি এরা রাজা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তারা মূলত শাহ সুজার অনুসারী। এদের মধ্যে ফতে খাঁ প্রথম আলীকদমে জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বুজুর্গ উমেদ খাঁর সাথে সন্ধি করে রামু পর্যন্ত জমিদারি বিস্তার করেন (জামাল উদ্দিন ২০১২, ৬০)। অশোক কুমার দেওয়ান *চাক্‌মা জাতি* গ্রন্থে রামুর অধিপতি ফতে খাঁকে চাকমা রাজা বলে উল্লেখ করেছেন (অশোক কুমার দেওয়ান ১৯৮২)। ফতে খাঁর পর এ অঞ্চলে জমিদার ছিলেন যথাক্রমে রাণী সোনাবি, শের জব্বার খাঁ, নুরুল্লা খাঁ, চন্দন খাঁ এবং জালাল খাঁ। বিভিন্ন সময় উত্থান পতনের পর এ জমিদারি ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সরে আসে। রাঙ্গুনিয়ায় এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেরমস্ত খাঁ। ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরমস্ত খাঁনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো শের জব্বার খাঁ রাঙ্গুনিয়ার জমিদারি ও পার্বত্যবাসীর নেতা হন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শের জব্বার খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শের দৌলত খাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে জানবক্স খাঁ চাকমাদের জমিদার ও রাজা নির্বাচিত হন। জানবক্স নিজেকে জমিদার বলে পরিচয় দিলেও তিনি বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জানবক্স ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে কলকাতায় গিয়ে গভর্নর-জেনারেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের অঙ্গীকার করে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। হাচিন্সনের বিবরণে দেখা যায়, ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আর একজন শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে চাকমাদের একটি বিদ্রোহ করেছিল। একে হাচিন্সন দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁ নামে অভিহিত করেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁও বশ্যতা স্বীকার করেন (Cotton 1880, 6)। জানবক্সের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তব্বার খাঁ উক্ত অঞ্চলের জমিদার হন। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে তব্বার খাঁনের মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা জব্বার খাঁ জুমিয়াদের জমিদার ও রাজা হন।

১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ধরমবক্স খাঁ জমিদারির লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ বছর বয়সে জমিদার ধরমবক্স খাঁ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার মোগল বংশজাত সুখলাল খাঁকে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব দেন। কিন্তু চাকমা সম্প্রদায় থেকে আসা ধরমবক্স খাঁ'র স্ত্রী কালিন্দী রাণী এ সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে আদালতে মামলা করেন এবং দীর্ঘ ১২ বছর পর ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অনুকূলে আদালত রায় দেন। তারপর থেকে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কালিন্দী রাণী জমিদারি পরিচালনা করেন (*Survey Report* 1938, 54)। অবশ্য এরই মধ্যে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে আলাদা হয়ে যায়।

খ. প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত জমিদার

মুসলমান শাসনামলে অনেক হিন্দু পরিবার বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে আসে। তারা মূলত রাজস্ব ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কালক্রমে তারা জমিদারে পরিণত হন। এদের অধিকাংশ পটিয়া, রাউজান এবং আনোয়ারায় বসবাস করে। বর্তমানেও এসব অঞ্চলে হিন্দুদের আধিক্য রয়েছে। চট্টগ্রামে মোগল বিজয়ের পূর্বে এদের কেউ কেউ আরাকানি শাসকদের অধীনে চাকুরি করেছিলেন। এদের মধ্যে ভবানী প্রসাদ কানুনগো, শান্তিরাম কানুনগো, কালি চরণ রায়, লক্ষ্মণচন্দ্র কানুনগো, কিশোর কানুনগো, রাজবল্লভ কানুনগো, হরিচন্দ্র কানুনগো, শরৎচন্দ্র কানুনগো, রাজারাম চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

কানুনগো পরিবার

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কানুনগো পরিবারের পূর্ব-পুরুষরা ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে গৌড় থেকে চট্টগ্রামে আসেন। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ভবানী প্রসাদ কানুনগোর সাথে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভবানী প্রসাদ কানুনগোর জমিদারি তাঁর পুত্র গৌরীশঙ্করের নামে বন্দোবস্ত হয়। গৌরীশঙ্কর ১৭৯০ থেকে ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে কোম্পানির দেওয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন (*Survey Report* 1938, 55)। কালিচরণ রায় ছিলেন 'তরফ প্রভাবতী'র প্রতিষ্ঠাতা। কানুনগোদের মধ্যে তিনি বেশ প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কালেক্টর ক্রফটস্ এর কাছ থেকে কালিচরণ রায় ৪০,০০০ টাকায় মহেশখালীর জমিদারি ক্রয় করেন। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী প্রভাবতী জমিদারির মালিক হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রভাবতীর নামেই জমিদারি বন্দোবস্ত হয়। প্রভাবতীর পর তাঁর পোষ্যপুত্র শরৎচন্দ্রের ছেলে কৈলাস চন্দ্র জমিদারির মালিক হন (Cotton 1880, 233)।

বৈদ্য বংশ

বৈদ্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম কানুনগোর পূর্ব পুরুষরা খুলনা থেকে চট্টগ্রামে আসেন। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের প্রশাসন শান্তিরামের সাথে জমি বন্দোবস্ত দেন। তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এখনও এরূপ প্রবাদ আছে যে, "শান্তিরামের নিকট মনসা আটকে যায়" (জামাল উদ্দিন ১৯৯১, ১১৩)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শান্তিরামের জমিদারি তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথের নামে বন্দোবস্ত হয়। বৈদ্যনাথ ১৮১২ থেকে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে কোম্পানির দেওয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর পুত্র হরচন্দ্র রায়ও একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। এছাড়াও হরচন্দ্র রায়ের দত্তক পুত্র গিরিশ চন্দ্র রায় এবং তদীয় পুত্র পূর্ণেন্দু বিকাশ রায়, সুখেন্দু বিকাশ রায় ও অমলেন্দু বিকাশ রায় এ পরিবারের উল্লেখযোগ্য জমিদার ছিলেন।

কোয়েপাড়ার জমিদার

রাজারাম চৌধুরী রাউজানের কোয়েপাড়ার জমিদার ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ চন্দ্র রায় পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। চন্দ্র রায় ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে আসেন এবং পটিয়া জেলার কুলগাঁও অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তার ছেলে রাম রায় কুলগাঁও থেকে রাউজানের কোয়েপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। রাম রায়ের দুই ছেলে আরকান রাজের অধীনে রাজস্ব বিভাগে চাকরি করতেন (Alamgir Muhammad Serajuddin, 1971, 24)।

গঙ্গাধর মজুমদারও জমিদার হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ বল্লব রায় ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আসেন। গঙ্গারাম মোগল আমলের শেষের দিকে এবং কোম্পানির আমলে খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কোম্পানির আমলে চাকরীজীবী থাকা অবস্থায় তিনি নিজস্ব যোগ্যতা বলে বিশাল জমিদারির মালিক হন।

কোম্পানির আশীর্বাদপুষ্ট জমিদার

১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসার পর কোম্পানির কিছু দেওয়ান ও বেনিয়া জমিদারি লাভ করেন। এদের মধ্যে পরান সরফ, রাজবল্লব দুলাল, গৌরী কিশোর দুলাল ও জয়নগর জমিদার উল্লেখযোগ্য। পরান সরফ একজন মুদ্রা বিনিময়কারী বা ব্যংকার ছিলেন। ১৭৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জমিদারি বাবদ ২৭ টাকা রাজস্ব প্রদান করেছিলেন (Alamgir Muhammad Serajuddin 1971, 184)। রাজবল্লভ ছিলেন চট্টগ্রামের বড় বাইশ জমিদারের মধ্যে একজন। তিনি নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং লক্ষীপুরে কোম্পানির দালাল হিসেবে কাজ করতেন (*Committee of Revenue* 25 June 1771)। চট্টগ্রামের অপর জমিদার গৌরী কিশোর দুলালও তার পরিবারের সদস্য ছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ কানুনগোর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা জমিদারি বিক্রি করা শুরু করেন। শেষের দিকে এ পরিবার জমিদারি হারিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করেন।

জয়নগর জমিদারিঃ (জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষাল)

কলকাতার খিদিরপুরের ভূকৈলাসের গোকুল চন্দ্র ঘোষাল চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জয়নগর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৬১ থেকে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্যারি ভেরেলস্টের সময় দেওয়ান ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ জমিদারিটি ছিল চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জমিদারি (মনসুর *সমকাল* ৫ জুন, ২০১৩)। জয়নগর জমিদারি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথাঃ ক) তরফ জয়নগর এবং খ) জয়নগর নোয়াবাদ মহাল। তরফ জয়নগর অন্যান্য জমিদারির মত একটি প্রতিষ্ঠিত জমিদারি। জয়নগর নোয়াবাদ মহাল তথাকথিত সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ভাইপো জয়নারায়ন ঘোষালের নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোকুল ঘোষাল ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের এক সনদের মাধ্যমে তাঁর ভাইপো জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে চট্টগ্রামের সমস্ত অনাবাদী জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের এক মামলায় গোকুল ঘোষালের সনদ জাল বলে রায় দেয়া হয়। ফলে উক্ত সনদ বলে প্রাপ্ত সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় (*Survey Report* 1938, 65)।

অন্যান্য জমিদার

আবদুর রহিম খাঁঃ আবদুর রহিম খাঁর বংশধর চট্টগ্রামের জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মীরসরাইয়ের বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী কাদের ইয়ার খাঁর পুত্র দিয়ানত খাঁ ও কাজীর দেউড়ির বিখ্যাত মীর

এহিয়ার কন্যা হাড়ি বিবির গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে হাড়ি বিবির সাথে আবদুর রহিম খাঁর বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তিনি গোত্রপ্রীতির কারণে তাতে আপত্তি জানায়। হাড়ি বিবি আর বিবাহ করেননি এবং তার চাচা চৌধুরী আমানত খাঁও ছিলেন চিরকুমার। হাড়ি বিবির মৃত্যুর পর বাকি খাজনার দায়ে বিশেষত: দেওয়ান গোকুল ঘোষালের চক্রান্তে তার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে নিলামে ছড়িয়ে খরিদ করে নেন এবং তা ১২৭০ নং তরফ জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে বন্দোবস্ত হয় (আহমদ মমতাজ ২০০৪, ৬৩)।

বাণীগ্রামের জমিদার

বাঁশখালির বাণীগ্রামের রায় এস্টেট জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বনমালী মজুমদার।[২] ব্রিটিশ আমলে এ পরিবারের অন্যতম জমিদার ছিলেন হরিনারায়ন চৌধুরী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার হরিনারায়ন চৌধুরী বাণীগ্রাম 'রায় এস্টেট' -এর মালিক হন। এ সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ টেকনাফ, উখিয়া, রামু, কক্সবাজার এবং চকরিয়ার বিশাল অংশ রায় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বকশি হামিদ

চট্টগ্রামের বাঁশখালির ইলশা গ্রামের জমিদার ছিলেন বকশি হামিদ। তিনি বাঁশখালির জমিদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি সরকারী অফিসার ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিদারও ছিলেন (আবদুল করিম ১৯৯৭, ২৩২)। ধারণা করা হয় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বকশি হামিদ সমগ্র বাঁশখালী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী সাতকানিয়া ও চকরিয়া থানার জমিদারি লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক কবি নওয়াজিশ খান তাঁর 'গুলে বাকাওলী' নামক পুঁথিতে বকশি হামিদের প্রশংসা করেছেন (মাহবুবউল আলম ১৯৯৮, ৪৩)।

মনু মিরজি পরিবার

মনু মিরজি বাঁশখালির ছনুয়া গ্রামের বাসিন্দা। এ পরিবারের আদি পুরুষ মীর দেওয়ান আলী (মোকারেমুলকাদের চৌধুরী ২)। মীর দেওয়ান আলীর পুত্র মীর মনওয়ার আলী ওরফে মনু মিরজি কুতুবদিয়ার উত্তর পশ্চিম দিকে জমি আবাদ করে বিশাল সম্পদের মালিক হন। কোম্পানির আমলে তিনি (১৭৭৮-১৮৭৫) বাঁশখালির ছনুয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ পরিবারের দানকৃত (ওয়াকফ করা) প্রায় ৩৫ দ্রোণ সম্পত্তির উপর মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও কবরস্থান বিদ্যমান (আবদুল করিম ১৯৯৭, ২৩৪)।

ফতেয়াবাদের জমিদার

চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র আট মাইল উত্তরে ফতেয়াবাদের অবস্থান। মোগল ও ব্রিটিশ আমলে ফতেয়াবাদের কয়েকটি হিন্দু ও মুসলমান পরিবার রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে নন্দী বংশ, দাশ বংশ, রক্ষিত পরিবার, পাল বংশ, চৌধুরী বংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ফতেয়াবাদের নন্দী বংশ পটিয়া থানার জঙ্গলখাইন অঞ্চলের নন্দীদের একটি শাখা। এ বংশের প্রথম পুরুষ মধু সূদন নন্দী। তাঁর পুত্র শিবরাম নন্দী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শিব রাম নন্দীর নামে 'তরফ শিব রাম নন্দী' বন্দোবস্ত হয়। শিবরামের পুত্র ঈশ্বর চন্দ্র নন্দী ব্রিটিশ আমলে 'বোর্ড অব রেভেনিউ'তে এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর কল্যাণে চট্টগ্রামের সরকারী মহলে ফতেয়াবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় (মাহবুবউল আলম ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯)।

ফতেয়াবাদের দাশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা দাশগুপ্তের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা থানার বৈদ্যবাটী গ্রামে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে এ বংশ ফতেয়াবাদে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশের নামে 'তরফ রাম সেবক' বন্দোবস্ত হয়। এ বংশের শরৎচন্দ্র সাব ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরে তিনি ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। সিএস (CS) জরিপের সময় তিনি সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করেছিলেন (আবদুল করিম ১৯৯৭, ২৩৪)।

রক্ষিত পরিবার

রক্ষিত পরিবার প্রধানত সেন বংশের শাখা-প্রশাখা। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া জয়ের পর লক্ষণ সেন ঢাকার বিক্রমপুরে এসে রাজ্য পরিচালনা করেন। এরই সূত্র ধরে এ বংশের কেউ কেউ চট্টগ্রামে চলে আসেন। এ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন রঘুরাম। রঘুরামের দুই পুত্র গঙ্গারাম ও মধুরাম। গঙ্গারাম রক্ষিত বংশের নোয়াপাড়া শাখা এবং মধুরাম ফতেয়াবাদ শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এ বংশের নামে ৭টি তরফ সৃষ্টি হয়। তরফগুলো হলো, তরফ ৪৭৭ (ব্রজলাল রক্ষিত), ১৩৭৯ (যদুরাম রক্ষিত), ১৮২৫ (মধুরাম রক্ষিত), ২৪২৪ (পার্ব্বতী চরণ, ত্রাহিরাম ও রাধাচরণ রক্ষিত), ২৯৩৪ (সাচিরাম রক্ষিত), ২৯৫২ (সাচিরাম নারায়ণ রক্ষিত) এবং ৩১৭৪ (তিলক রাম রতন রক্ষিত) (মাহবুবউল আলম ১৯৬৬, চার)।

মৌলভী হামিদুল্লাহ খাঁ পরিবার

উনিশ শতকের স্বনামধন্য কবি খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খাঁ চট্টগ্রামের এক অভিজাত পরিবারে ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারটি মোগল ও ইংরেজ আমলে চট্টগ্রামের অন্যতম বৃহৎ জমিদার পরিবার ছিল। তাঁর পিতা ওবেতুল্লাহ খাঁ প্রথমদিকে 'সেরেস্তাদার' ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি লাভ করে ক্রমে সদর মূনসেফ, ডেপুটি কালেক্টর ও আলা সদর আমীনের পদ প্রাপ্ত হন (মাহবুবউল আলম ১৯৬৬, ১২৩)। লোকে তাকে 'চাঁদ মিঞা দারোগা' বলে অভিহিত করত।

গ. ইউরোপীয় জমিদার

চট্টগ্রামের ভূমি-ব্যবস্থার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ইউরোপীয় জমিদারদের উপস্থিতি। এ সকল ইউরোপীয় জমিদারদের মধ্যে পর্তুগীজদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তাদের মধ্যে পর্তুগীজ মহিলা জমিদার আওরা-দ্য-বারোজ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি হাটহাজারীর অন্তর্গত ইছাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আওরা-দ্য-বারোজের মৃত্যুর পর ডিয়েড্‌রিচ মার্কোয়াড্ তার জমিদারির মালিক হন। জোয়ান-দ্য-বারোজ নামে তাঁর এক ভাই ছিল। তিনি চট্টগ্রাম জেলার প্রধান পর্তুগীজ পরিবার 'ফ্রীটাস'দের নিকট আত্মীয় ছিলেন (আহমদ শরীফ ১৩৬৫, ৩৮-৪১)।

১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে হ্যারি ভেরেলস্ট জনৈক ইউরোপীয় হার্বাট সাদারল্যাণ্ডকে 'খয়রাত মদদ-মাশ' হিসেবে কুতুবদিয়া দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র চার্লস সাদারল্যাণ্ড কুতুবদিয়ার মালিক হন। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস সাদারল্যাণ্ডের মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নী সুসনা সাদারল্যাণ্ড উত্তরাধীকারী হন। কিন্তু জেলা কোর্টের ডিক্রির অনুবলে নিকটতম আত্মীয় হিসেবে তাঁর চাচাতো বোন জোহনা ফার্নেন্দেজও এর একাংশের মালিক হন। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় খয়রাতি দান সরকারে প্রত্যর্পিত ঘোষণা করেন (Cotton 1880, 231)।

ইউরোপীয় জমিদারদের মধ্যে মেরী স্পার্ক্‌স্‌ও ছিলেন অন্যতম। তিনি জমিদার হিসেবে বিবি ইসপ্রাক নামে সুপরিচিত ছিলেন। কালেক্টর ফ্রান্সিস ল প্রদত্ত এক পাট্টা বলে তিনি চকরিয়া থানার পেকুয়া দ্বীপের পহরচাঁদায় এক বিরাট তালুকের মালিক হন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে উক্ত অঞ্চল আবাদ করেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে কালেক্টর শিয়ারম্যান বার্ড বোর্ডের কাছে রিপোর্ট করেন যে, এ স্থান মগদের হামলার এলাকায়

পড়ায় জঙ্গল কেটে আবাদ করতে মিসেস স্পার্কসের বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে (*Revenue Consultation* 8 May, 1789)। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হার্ভে জরিপের মাধ্যমে ৩৮৩ নং তালুকে উক্ত অঞ্চলটি দখলদার হিসেবে মোহাম্মদ কালু ও কুমার আলী চৌধুরীর নামে বন্দোবস্ত হয় (*Noabad Correspondence* 1886, 122)।

ঘ. আরাকানি জমিদার

চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাজ মোহাম্মদ, আতিকুল্লাহ্, ঠাকুরচাঁদ, সাদুল্লাহ, আজিজুল্লাহ, ফকীর মোহাম্মদ, রোশন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান থেকে এসে কোম্পানির এলাকায় আশ্রয় নেয়। আরাকানে তারা জমিদার, তালুকদার ছিল বলে জানায়। বেইটম্যান তাঁদেরকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের চাম্বল, পুইছড়ি, সোনাইছড়ি, পোলাও, কৌনিম, বড় ফালং, কুতুবদিয়া, হারবাং, সরল, বহলছড়ি, বঙ্গতেরাম, বড়ইতলি প্রভৃতি স্থানের জমিদারি বন্দোবস্ত দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জয়নগর মহালের আপত্তির ফলে তাঁদেরকে জয়নগর মহালের অধস্তন ভূমধ্যধিকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (Cotton 1880, 86)। অবশ্য এদের অধিকাংশ পরবর্তী সময়ে আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন।

আরাকানি জমিদারদের মধ্যে লাহ্ওয়া মোরং -এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান হতে কোম্পানির অঞ্চলে আসেন। তাঁর প্রার্থনা মতে, কোম্পানির প্রশাসন দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে উখিয়া ও নাফ নদী, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে রেজুখাল -এর অন্তবর্তী স্থানের ভূমি তাকে বন্দোবস্ত দেন। টেকনাফে লাহ্ওয়া মোরং -কে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ায় পরবর্তীকালে কোম্পানির জন্য অনুকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাঁর আগমনে আরাকানিরা উদ্বুদ্ধ হয় এবং পর্যায়ক্রমে আরাকানিরা চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। এতে করে দক্ষিণ চট্টগ্রামে পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ হয়ে দক্ষিণ চট্টগ্রাম নোয়াবাদ ভূমির আওতায় আসে (মাহবুবউল আলম ১৯৬৬, ১২৩)।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। যার ফলে এখানে সর্বাধিক পরিমাণে জমিদারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যার অধিকাংশই ছিল কৃষকসম ছোট জমিদার। বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জমিদারের অস্তিত্ব দেখা যায় না। আলোচনার মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ জমিদারের উৎপত্তির কারণ চিহ্নিত করেছি। মূলত ভৌগোলিক অবস্থা এর জন্য সর্বাধিক দায়ী ছিল। বাংলার অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় এখানে জমিদারের শ্রেণি বিভাগও আলাদা। চট্টগ্রাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকের অধীনে থাকলেও ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে এখানে মুসলমান এবং হিন্দুরাই ছিল প্রধান জনগোষ্ঠী। সীমান্তবর্তী প্রদেশ হওয়ায় এখানে সামরিক বাহিনীর প্রধান্য ছিল সর্বাধিক। কালক্রমে সামরিক বাহিনীর পদস্থ ব্যক্তিরা এবং প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জমিদারে পরিণত হলেও নোয়াবাদ ভূমির সম্প্রসারণের সাথে সাথে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জরিপের ফলেই কেবল ৩২,২৫৮ জন জমিদারের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে আরাকানিদের আগমন এবং তাদের কারও কারও জমিদারি লাভ এবং পরবর্তী সময়ে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলেও নতুন জমিদারের উদ্ভব হয়। এদেশে অবস্থানরত ইউরোপীয়রাও চট্টগ্রামের জমিদারে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে অন্যান্য অঞ্চলের (যে সমস্ত অঞ্চলে বড় জমিদারি বিরাজমান ছিল) জমিদারদের মত চট্টগ্রামের অধিকাংশ জমিদাররা

ঐতিহাসিক নিদর্শনের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেনি। মূলত চট্টগ্রামে কৃষকসম অধিকাংশ জমিদার কোন প্রকারে জীবন ধারণ করত।

টীকা

[১] আঠারো শতকের এ সমস্ত জমিদারদের মধ্যে রসিদ খান, এয়াছিন খান, ফরদাস খান, মজুফর খান, নুরউল্লা খান, রহমতউল্লা খান, সবরলন্দা খান, দেওয়ান মণিরাম, ছুটি খান, সদাকত খান, আঙ্কর খান, জাফর খান, আকা মহাম্মদ নেজাম, বিল্লা খান, ইশা খান, শেরমস্ত খান, জবরদস্ত খান, ফেদাই খান, এয়াকুপ খান, আদিকত খান, বশরত খান, সেরাজউদ্দিন মহাম্মদ খান, হোসেন কুলী খান, সরফরাজ খান এবং নিয়ামত খান প্রভৃতি ছিলেন আফগান বংশোদ্ভুত। অপরদিকে তুল্লা গাজী, ফতে গাজী, চান গাজী, সোনা গাজী, মিন্না গাজী, জাফর গাজী প্রভৃতি সামরিক যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে গাজী উপাধি লাভ করে। এছাড়া বিজয় সিং, সোরাল সিং, জয় সিং, আজিব সিং, দেবী সিং, হারি সিং, ফসাল সিং, লোচমান সিং, তাজ সিং প্রভৃতি জমিদাররা ছিলেন হিন্দুস্থানী। মনগট রাম হাজারী, জগত হাজারী মোগল আমলে মনসবদার উপাধিধারী ছিলেন (চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি ২০০৪, ৬৪-৬৫)।

[২] বাণীগ্রামের জমিদারদের আদি পুরুষ হলেন দনুজ দলন দেব। প্রথম দিকে এ বংশের পূর্বপুরুষ শাহ শুজার দেওয়ান হিসেবে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর প্রায় ৫০/৬০ বছর পর সে বংশের কোন উত্তর পুরুষ চট্টগ্রামে আগমন করেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি ও চন্দনাইশের হারালা গ্রামে কিছুকাল অবস্থানের পর রাণীগ্রাম এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (আবদুল করিম, ২৩০)।

তথ্যসূত্র

আবদুল করিম। *বাঁশখালির ইতিহাস ও ঐতিক্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

আহমদ মমতাজ। *মীরসরাইর ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: দিবা প্রকাশনী, ২০০৪।

আহমদ মমতাজ ও রাইহান নাসরিন। *চট্টল মনীষা, প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত*। ঢাকা: চট্টল প্রকাশনা, ২০১৩।

চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*। ঢাকা: গতিধারা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০০৪।

জহিরুল ইসলাম। *খুরুশকুলের ইতিহাস*। কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, ২০০১।

জামাল উদ্দিন। *দেয়াঙ পরগণার ইতিহাস, আদিকাল*। চট্টগ্রাম: বলাকা প্রকাশন, ১৯৯১।

জামাল উদ্দিন। *মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী*। চট্টগ্রাম: বলাকা প্রকাশন, ২০১২।

মাহবুবউল আলম। *চট্টগ্রামের ইতিহাস, নবাবী আমল*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

. . . . . *চট্টগ্রামের কতিপয় জমিদার পরিবার*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৬।

. . . . . *চট্টগ্রামের ইতিহাস, কোম্পানী আমল*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৭।

. . . . . *রঙ বেরঙ*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৮।

মুহম্মদ নূরুল ইসলাম। *উখিয়ার ইতিহাস*। কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, ২০১০।

মোকারেমুলকাদের চৌধুরী (সম্পাদনা)। *মনুমিয়াজী পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। (আংশিক) ছনুয়া, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম।

মৌলবী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর। *আহাদিসুল খাওয়ানিন (চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস)*। অনুবাদ ড. খালেক মাসুকে রসুল, সম্পাদনা ও টীকাভাষ্য তানবীর মুহম্মদ। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩।

শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা)। *নবীনচন্দ্র-রচনাবলী আমার জীবন*।(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৬।

রাজকুমার চক্রবর্তী। *সন্দ্বীপের ইতিহাস*। ১৯২৩।

সুপ্রকাশ রায়। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*। কলকাতা: বুক ওয়াল্ড, ২০০০।

প্রবন্ধ

অশোক কুমার দেওয়ান। *চাকমা জাতির ইতিহাস*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গবেষণা পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৮২।

আহমদ শরীফ। এতিম কাসেম বিরচিত আওরা-দে-বারোজ প্রশস্তি, [১৭৭৫-৮০]। *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ১৩৬৫ বাংলা।

কাজী আবুল মনসুর। *চট্টগ্রামের গৌরবগাথা -৩ ইংরেজ ও একজন গোকুল ঘোষাল*, সমকাল, ৫ জুন, ২০১৩।

Books

Alamgir Muhammad Serajuddin. *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong, 1761-1785. Chittagong:* University of Chittagong, 1971.

Cotton, Henry J. S. *Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta:* Bengal Secretariate Press, 1880.

Hunter, W W. *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VI. London: Turbner & Co. 1876. Delhi: Repriented by D. K. Publishing House, 1973.

Hutchinson, R. H. S., *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers*. Allahabad: *Chittagong Hill Tracts*, Pioneer Press, 1909.

Nurul Islam Khan (Edited), *Bangladesh District Gazetteer Noakhali*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1977.

Powel, B. H. Baden., *The Land Systems of British India.* Vol. I. Oxford Clarendon Press, 1892.

দলিল (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত)

মাহ্‌বুব উল আলম কর্তৃক পাকিস্তান কাউন্সিল চট্টগ্রাম আয়োজিত ফতেয়াবাদ হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত *প্রাচীন ফতেয়াবাদ* শীর্ষক আলোচনা সভায় ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখে পঠিত প্রবন্ধ।

Bengal Revenue Consultation (Revenue Consultation)

Correspondence on the Resettlement of the Noabad Lands in the District of Chittagong and on the Survey of the District, Vol. III, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1886 ((*Noabad Correspondence).*

Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Chittagong, 1923-33, by J. B. Kindersley, Alipore, Bengal Government Press, 1938 (*Survey Report, 1923-33*).

.*Final Report of the Survey and Settlement of the District of Chittagong, 1888 to 1898*, by C. G. H Allen, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1817 (*Survey Report).*

Firminger, W. K. *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report,* (Delhi, Today and Tomorrow's Printers & Publishers, 1917.

Proceedings of the Committee of Revenue (Committee of Revenue).